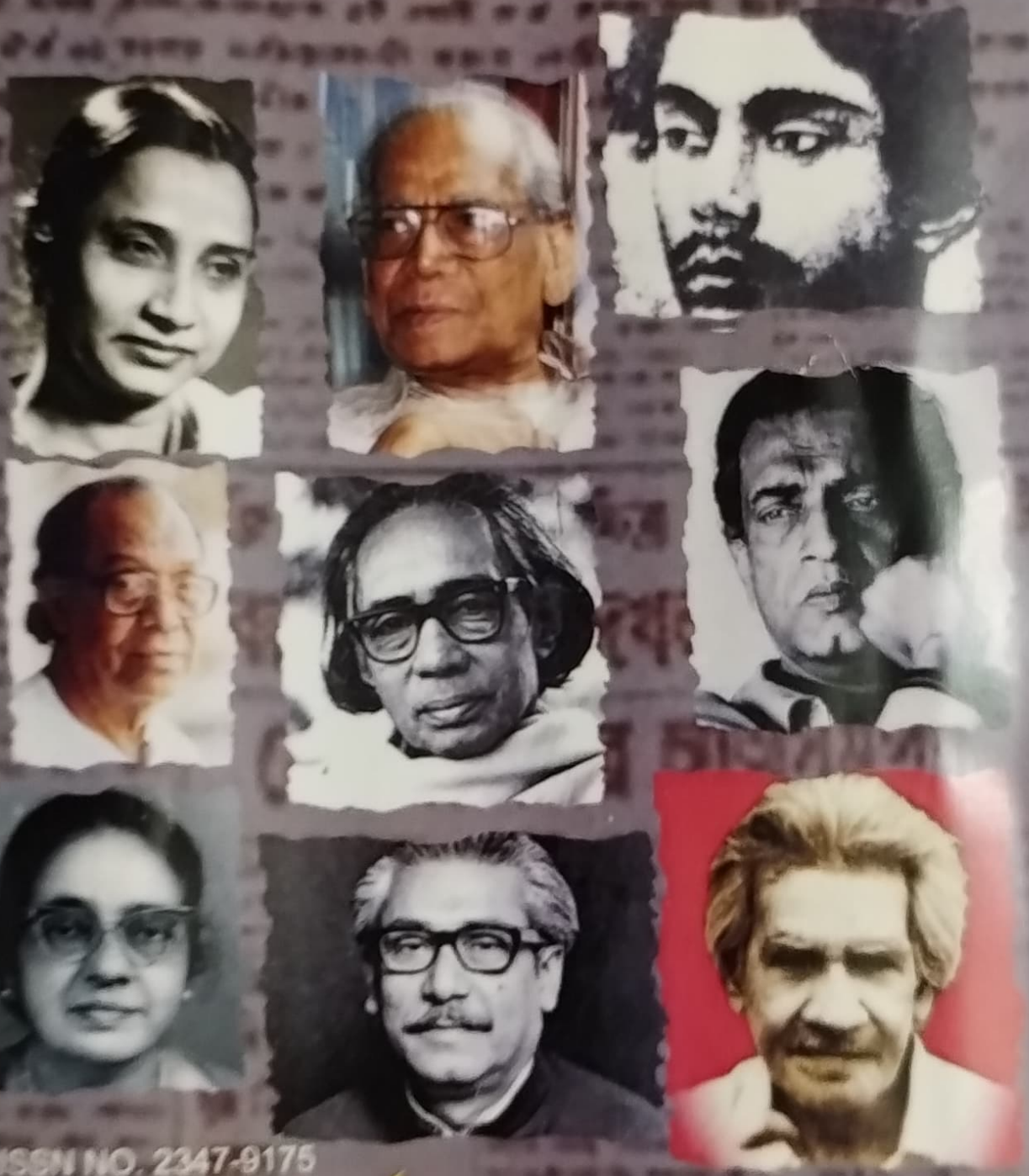

ISSN NO. 2347-9175

কণিকা

নবম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ২০২১

বিশেষ শতবর্ষ সংখ্যা

কর্ণিকা

নবম বর্ষ, ১ম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর, ২০২১

ISSN NO. 2347-9175

বিশেষ শতবর্ষ সংখ্যা

সম্পাদক
তুষার দে

সহসম্পাদক
কল্যাণ মুখার্জী
পারমিতা

প্র ব ন্ধ

শতবর্ষে 'বিদ্রোহী' ● সত্যবতী গিরি ● ২৫

সোমনাথ হোরের শিল্পকর্ম : বেদনায় জীবনের ধ্বজা ● কুন্তল রুদ্র ● ৩৭

শিবনারায়ণ রায় : স্মৃতিতর্পণ ● অহনা বিশ্বাস ● ৪৮

বঙ্গবন্ধুর 'কবিগুরু' ● মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ● ৫২

একটি মৃত্যু : বঙ্গবন্ধু স্মরণে ● সুদীপ দাশ ● ৫৫

পুনর্পাঠ : ননী ভৌমিক ● তড়িৎ রায়চৌধুরী ● ৫৭

সত্যজিতের শান্তিনিকেতন : শান্তিনিকেতনের সত্যজিৎ ● কল্যাণ মুখার্জী ● ৬৪

সত্যজিৎ রায়ের নির্বাচিত সিনেমায় নারী চরিত্র ● লিপিকা সাহা ● ৭২

রবীন্দ্রচেতনায় বিশ্বভারতী : শতবর্ষে ফিরে দেখা ● পারমিতা ● ৭৬

সুকুমারী ভট্টাচার্য : প্রাচীন নারী মনন ও সমাজ ● অভিষেক মুসিব ● ৭৯

নীলিমা ইব্রাহিম ও শক্তিমত্তার সাক্ষ্যমঞ্চে
'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' ● ড. উত্তম বিশ্বাস ● ৮৬

বিমল করের ছোটগল্পে দাম্পত্য সম্পর্ক ● রুবিয়া বানু ● ৯৫

বিমল কর : ছোটগল্পে নানা রঙের ছটা ● সামন্যা সেনগুপ্ত ● ১০১

শতবর্ষে আহমদ শরীফ : এক বিরল বাঙালি মনীষা ● তুষার দে ● ১০৬

স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরের চৌরিচৌরা ঘটনা :
একটি আলোচনা ● সৌরভ লায়েক ● ১১৪

পু স্ত ক স মা লো চ না

কাল ছিল ডাল খালি : একটি পাঠপ্রস্তাব ● দেবায়ন চৌধুরী ● ১২০

নদীকেন্দ্রিক জীবনবৃত্তের একটি সম্পূর্ণ সংকলন : 'মুদ্রা' ● কৌশিক কর্মকার ● ১২৩

লেখক পরিচিতি ● ১২৬

সত্যজিতের নির্বাচিত সিনেমায় নারীচরিত্র

লিপিকা সাহা

বাংলা সিনেমার জগতে অস্কার বিজয়ী সত্যজিৎ রায় একটি অতিপরিচিত নাম। তিনি নানান ধরনের সিনেমা তৈরি করে ছিলেন। তবে তাঁর অধিকাংশ সিনেমাই নারীকেন্দ্রিক। কেননা যেখানে মুখ্য ভূমিকায় নারীচরিত্র নেই সেখানেও কোন একটি নারীচরিত্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে সিনেমার ঘটনাবলী, প্রকাশিত হচ্ছে অন্যান্য চরিত্রের দুর্বলতা বা সাহস, উন্মোচিত হচ্ছে মানুষের মনের জটিল ভাব। ফলে পার্শ্বচরিত্রে থেকেও সেই নারীই হয়ে ওঠে কাহিনির পক্ষে অপরিহার্য। আবার যেখানে নারীচরিত্র মুখ্য ভূমিকায় সেখানে তাকেই প্রতিরোধ করতে হচ্ছে সমস্ত কিছু, ফুটে উঠেছে তার চরিত্রের নানাদিক, তার পছন্দ-অপছন্দ, সংবেদনশীলতা-অনাসক্তি, শক্তি ও সৌন্দর্য। তার সিনেমায় মেয়েরা মানসিক দিক থেকে অনেক বেশি দৃঢ়, ব্যবহারিক দিক থেকে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট, প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় অনেক বেশি সাহসী ও দৃপ্ত। এই প্রবন্ধে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'মহানগর', 'জনঅরণ্য', এবং 'সীমাবদ্ধ' এই চারটি সিনেমার কয়েকটি নারীচরিত্রকে নিয়ে আলোচনা করব।

'কাঞ্চনজঙ্ঘা' সিনেমার কাহিনি গড়ে উঠেছে ভালোবাসার সমস্যাকে কেন্দ্র করে। মনীষা শিক্ষিতা, রুচিসম্পন্ন আধুনিক মেয়ে। নিজের বিষয়ে তার স্বাধীন মতামত রয়েছে, তীব্র তার আত্মমর্যাদাবোধ। কাঞ্চনজঙঘার মনীষাই প্রথম নারী যে তার বাবার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, প্রতিষ্ঠা করতে চায় নিজের অধিকার। বাবার পচ্ছন্দ করা ছেলেকে বিয়ে করতে তার আপত্তি নেই কিন্তু সেই ছেলেকে তার পচ্ছন্দ হতে হবে অর্থাৎ যার সঙ্গে তার মনের মিল হবে। বাবাকে সে অসম্মান করতে চায় না। তাই বাবার পচ্ছন্দ করা পাত্র প্রণবেশের সঙ্গে সে দেখা করে, মেলামেশা করে। দ্বিতীয় দিন সাক্ষাতের সময় মনীষা বলে 'আমি কিন্তু বেশি সাজগোজ করছি না।' হয়তো প্রথম দিন সে করেছিল কিন্তু সাক্ষাৎ- এর পর সে বুঝতে পারে প্রণবেশের সঙ্গে তার মনের মিল হবার নয়। তাই সে আর সাজগোজ করতে চায় না। সে চায় প্রণবেশ তাকে শারীরিক সৌন্দর্যের চেয়ে মানসিক সৌন্দর্য দিয়ে বিচার করুক।

পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে অর্থনৈতিক টালমাটাল অবস্থায়, সাধারণ যুবসমাজ যখন অনিশ্চয়তার মুখোমুখি সেই সময় প্রণবেশের মত বিলেত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার ছেলেরাই

তো পাত্র হিসেবে উপযোগী। মনীষা দেখেছে এই রকমই একটি উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে তার দিদির বিয়ে হয়েছিল কিন্তু দুজনের মনের মিল না হওয়াই সেই দাম্পত্য সম্পর্ক ভাঙনের মুখে। তার মা লাবণ্য আর বাবা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যেও মনের মিলের থেকে কর্তৃত্বের জোরই বেশি। লাবণ্য চায় না অণিমার মতো মনীষারও জীবনটা নষ্ট হয়ে যাক।

মানুষ হিসাবে প্রণবেশকে অনেকটাই চেনা হয়ে গেছে মনীষার। শুধু বাবার কথা শুনে সময় কাটানো। কিন্তু সময়ই কাটতে চায় না। অসহ্য হয়ে ওঠে প্রণবেশের সান্নিধ্য। তাই এক সময় সে বলেই ফেলে 'আমরা যদি এখন আর কথা না বলে শুধু চুপচাপ হাঁটি'। কথার মাধ্যমেই ঘটে মনের আদান প্রদান। কিন্তু কথার মাধ্যমে অন্যকে জানা বা বোঝার চেষ্টা না করে যদি শুধু আমিত্বেরই প্রকাশ ঘটে তাহলে সেই ব্যক্তি কি করে অন্য আরেকজনের মনকে স্পর্শ করবে।

লাবণ্য যা পারেনি, অণিমা যেখানে ব্যর্থ, সেটাই করতে চলেছে মনীষা। সে জানে প্রণবেশকে বিয়ে করতে না চাইলে তাকে অনেক ঝড়ঝাপটা সহ্য করতে হবে। সামলাতে হবে তার বাবার প্রবল প্রতিরোধ। তবুও সে আপসহীন, দৃঢ়। তার প্রতিবাদে কোন উচ্চস্বর নেই, উত্তেজনা নেই, আছে শুধু নীরবে সরে আসা। এই মৃদু প্রতিবাদের জোর তার বাবার আমিত্ব ঘোষণার আস্ফালনের চাইতে অনেক বেশি। ছোটবেলা থেকে নিরাপদ সচ্ছল জীবনে বড় হয়ে বিলেত ফেরত পাত্রকে বিয়ে করার প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করে সে নিজের অধিকার বোধকে প্রতিষ্ঠা করে তুলেছে। কেননা প্রেম-ভালোবাসা-বিবাহ এমনই একটা জিনিস যেখানে নিজের অধিকারের প্রশ্নটাই বড় হয়ে ওঠে।

'মহানগর' ছবিতে দেখতে পাই আরতি চরিত্রটিকে। ষাটের দশকে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে সুব্রতর একার রোজগারে সংসার চালানো সম্ভব হচ্ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে অন্তঃপুরে থাকা আরতিকে সেলস গার্লসের চাকরি নিয়ে ঘরের বাইরে বেরোতে হয়। এই প্রয়োজনটা প্রথমদিকে অনুভব করে সুব্রত। উৎসাহটাও তারই ছিল, শ্বশুর শাশুড়ি কারোরই এতে মত ছিল না কিন্তু সুব্রতই তাদের বোঝায়। সংসারে স্বামীকে সাহায্য করার জন্য আরতিও রাজী হয়ে যায়। অন্তঃপুর থেকে বাইরে কাজের জগতে এসে নানা সমস্যা, মানসিক দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে নতুন কাজ, নতুন লোকজন এবং নতুন পরিবেশের সঙ্গে তাকে মানিয়ে নিতে হয়। ধীরে ধীরে আরতি যখন বাইরের পরিবেশে সাবলীল হয়ে উঠছে তখনই ঘনিয়ে আসে আর এক সমস্যা। যে মানুষটির উৎসাহে ও প্রেরণায় আরতি বাইরে বেরিয়ে এসেছিল সেই অতিপ্রিয় মানুষটিই তাকে ভুল বুঝতে শুরু করেছে।

আরতি সংসারী ও কর্তব্যপরায়ণ। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর বাড়ি ফিরে প্রতিকূল পরিবেশ দেখে সে বুঝতে পারে জীবন সংগ্রামে সে একা, নিঃসঙ্গ। রক্ষণশীল শ্বশুর বউমার বাড়ির বাইরে কাজ করতে যাওয়াটা মেনে নেয়নি। শাশুড়ি মুখ ভার করে আছে।

এইসময় যাকে তার সবচেয়ে বেশি দরকার সেই স্বামীও তাকে ভুল বুঝছে। তখন আরতি বুঝতে পারে বাড়ি কিংবা অফিস সর্বত্রই পুরুষরাই নির্ধারণ করে মেয়েদের চলাফেরার ক্ষেত্রটি।

অফিসে বস মিঃ মুখার্জী এবং সহকর্মীদের সঙ্গে আরতির সুসম্পর্ক রয়েছে। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে ইডিথের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়। বাড়িতে শ্বশুর, শাশুড়ি, ননদ সকলের সঙ্গেই আরতির ভালো সম্পর্ক রয়েছে। অন্তঃপুর থেকে বাইরের জগতে পর্দাপণের পর আরতি চরিত্রে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে থাকে তার সহমর্মিতা বোধ, সাহস, নীতিবোধ, আপসহীন মনোভাব এবং প্রতিবাদী সত্তা। মিঃ মুখার্জী তাকে প্রলোভন দেখালেও সে তা প্রত্যাখ্যান করে। এখানে সে সম্পূর্ণ একা। সহকর্মীর পাশে দাঁড়িয়ে সে পুরুষ সমাজের অন্যায় মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। সহকর্মী ইডিথের সাথে যে অন্যায় হয়েছে তার সাথে আপোস না করে সে প্রতিবাদ স্বরূপ রেজিগনেশন লেটার ধরিয়ে দেয় মিঃ মুখার্জীকে। আরতি জানে তার স্বামীর চাকরি নেই। এই দুর্দিনে তার নিজের চাকরিটা কত প্রয়োজন কিন্তু আরতি অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেনি, নৈতিকতার প্রশ্নটাই তার কাছে বড় হয়ে উঠেছে। তাই সহকর্মী ইডিথের সাথে হওয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে নিজের চাকরি থেকে ইস্তফা দিতে দ্বিধা বোধ করেনি।

এই প্রসঙ্গে অন্য একটি ছবির নারী চরিত্রের কথা মনে পড়ে সে হল 'জনঅরণ্যে'র কণা। কণা সোমনাথের বন্ধু সুকুমারের বোন। রোগা, শ্যামলা, দুদিকে বিনুনি ঝোলানো ফ্রক পরা মেয়েটির পাড়ার বখাটে ছেলেদের ক্ষুধার্ত চোখের সামনে বেঁচে থাকা। বাড়ির বিরুদ্ধ পরিবেশকে মানিয়ে নিতে না পেরে বা কোনো মিথ্যা প্রেমের প্রলোভনকে সত্যি বলে স্বীকার করে নিজেই হয়ে পড়েছে শিকার। একদিন চোরা বাঁকের পথে হারিয়ে গিয়ে হয়ে পড়েছে পণ্য।

কণাকে ছবিতে আমরা দুবার দেখতে পাই, একবার প্রথমে আর শেষবার। এই দুয়ের মধ্যে অনেক সময় অতিবাহিত হয়েছে। কণার জীবনে ঘটেছে বিরাট পরিবর্তন। পরিচালক আমাদের সেগুলো দেখাননি, তবে আমাদের অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না যে তার মধ্যে রয়েছে অনেক প্রতারণা, অনেক বিপর্যয়। শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাকে মোকাবিলা করতে হয়েছে নিজের সঙ্গে, নিজের শরীর ও মনে ঘটেছে অনেক রক্তক্ষরণ। স্বাভাবিক জীবন থেকে ছিটকে পড়ে সমাজের চোখে সে এখন নষ্ট মেয়ে।

অবস্থার চাপে পড়ে সোমনাথ পেশা হিসাবে যে পথটি বেছে নিয়েছে বা নিতে বাধ্য হয়েছে সেই পথটি খুবই পিচ্ছিল। এই পথে তাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে নটবর। কাদা ঘেঁটে বেড়ালেও পাঁকাল মাছের মতো তার গায়ে কোনো কাদা লাগে না। কিন্তু সোমনাথ তার বিবেক নিয়ে এখনও দ্বিধাগ্রস্ত। মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ তাকে তাড়িত করে। নটবর আর সোমনাথ দুজনে মিলে গোয়েঙ্কার জন্য মেয়ে খুঁজতে বের হয়। শেষ পর্যন্ত

একটি মেয়েকে খুঁজে পায়। ট্যাক্সিতে উঠে কণাকে চিনতে পেরে সোমনাথ আঁতকে ওঠে। লজ্জায় ঘৃণায় সোমনাথের মাথা নিচু হয়ে যায়। এ কি করছে সে? কোথায় নেমে যাচ্ছে সে? সোমনাথ কণাকে বলে 'আমি গাড়ি ঘুরিয়ে নিচ্ছি, হোটেলে যাব না, যাবার দরকার নেই।' কণা কিন্তু এখানে মানসিকভাবে অনেক দৃঢ়। ভাগ্যকে মেনে নিতে যতটুকু সাহস ও সততার প্রয়োজন সেটুকু তার আছে। মিথ্যা ভণিতা করে সে আত্মগোপন করে না। দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেয় আমার নাম যূথিকা। তার এই জবাব শুনে সোমনাথ কুঁকড়ে যায়। কণার এই জবাব যেন কাপুরুষ সোমনাথের মতো মিথ্যা দিয়ে আড়াল করে রাখা পুরুষশাসিত সমাজের নৈতিকতার প্রতি ধিক্কার। সোমনাথের দ্বিধাগ্রস্ততা বিবেকের তাড়নায় নয়, ভালোমানুষ সেজে থাকার দ্বিচারিতায়। কণা সেই মুখোশটাকেই টেনে খুলে দেয়। সত্যকে মেনে নেওয়ার ক্ষমতা কণার মধ্যে আছে, তাই সোমনাথকে বলে যাবার জন্যই তো এসেছিলেন।

'সীমাবদ্ধ'র সুদর্শনা অর্থাৎ টুটুল চরিত্রটিকে দেখতে পাই সম্পূর্ণ অন্য ভূমিকায়। ছবিতে শ্যামলেন্দুর কাছে কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির আকাঙ্ক্ষা এতটাই তীব্র হয়ে উঠেছিল যে নৈতিক অনৈতিকতার ভেদরেখা তার কাছে অস্পষ্ট হয়ে যায়। নিজের স্বার্থে জীবিকার প্রয়োজনে নৈতিকতা সম্পর্কে সে নিজস্ব মূল্যবোধ গড়ে তোলে। এই মূল্যবোধের ভিত্তি নড়ে ওঠে সুদর্শনা (বা টুটুল) আসার পর। প্রতিযোগিতার দৌড়ে যে সাফল্য সে করায়ত্ত করতে চেয়েছিল, তাকে পাওয়ার পর এক গভীর শূন্যতা এসে গ্রাস করে। শ্যামলেন্দুর পরিশ্রমের পুরস্কার কিন্তু শেষ অবধি নিঃসহ একাকীত্ব। তার একমাত্র সঙ্গী পাটনা থেকে আসা শ্যালিকা টুটুলও আস্তে আস্তে দূরে সরে যায়। শেষ দৃশ্যে টুটুল যখন শ্যামলেন্দুর উপহার দেওয়া ঘড়ি ফেরত দিয়ে দেয় তখন শ্যামলেন্দুর আদর্শচ্যুতি নীরব ধিক্কারেই মূর্ত হয়ে ওঠে। টুটুলের চোখে শ্যামলেন্দু তখন আর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝকঝকে ছাত্র নয়, সে আর দশজন কেরিয়ারমনস্ক বক্সওয়ালাদের একজন। টুটুলের নীরব প্রতিবাদে শ্যামলেন্দুর নিঃসঙ্গ মূর্তিটা আরও প্রকট হয়ে ওঠে।

এই প্রবন্ধে কয়েকটি মাত্র নারী চরিত্র নিয়ে আলোচনা করা হল। সত্যজিৎ নারীচরিত্রগুলির মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম ও দরদি বিশ্লেষণে তাদের চরিত্রের অন্তর্গত আত্মবিশ্বাসের দিকটি তুলে ধরতে চাইতেন। নিতান্ত গৌণ ভূমিকা ছাড়া ছোট বড় সব চরিত্রের নারীর ভিতরকার এই প্রত্যয়ের শক্তিটাকে তিনি তুলে ধরেছেন বলেই তার ছবির নায়িকারা এমন ব্যক্তিত্বময়ী।

গ্রন্থঋণ:

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, চলচ্চিত্র সমাজ ও সত্যজিৎ রায়, আসানসোল: ফিল্ম স্টাডি সেন্টার (১৯৮০)।
বিভাস মুখোপাধ্যায়, প্রসঙ্গ সত্যজিৎ : বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন, চলচ্চিত্র চর্চা, ২০১৮, কলকাতা।